Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা ফারহানা ইয়াসমিন

রোলঃ 228022059

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা ফারহানা ইয়াসমিন

রোলঃ 228022059

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা ফারহানা ইয়াসমিন, আইডিঃ 228022059 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদ: ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোসা ফারহানা ইয়াসমিন

আইডিঃ 228022059

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য হল কোন কিছু শুরু করার আগে তার বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যেমন আমরা কোন কাজ বড় বা ছোট হলেও শুরু করার আগে তার পূর্ব পরিকল্পনা করে রাখি সেই ব্যাপারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ধারণার নিয়ে রাখি ঠিক তেমনি জিহাদ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হল জিহাদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হওয়া বর্তমান সমাজকে শান্তিপূর্ণভাবে রাখতে এ বিষয়ে সুধারণা রাখা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে দুই জায়গায় দুটি আয়াতের মাঝে জিহাদ ও সবর, জিহাদ ও ধৈর্য ধারণ দুটি শব্দকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন

**** সূরা আলে ইমরানের ৩:১৪২ নম্বর আয়াতে আল্লাহতালা ইরশাদ করেছেন -***

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْ
جَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে?[১] যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন! [২]

__[১]__ অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে এবং কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? না, বরং জান্নাত তারাই লাভ করবে, যারা (আল্লাহ কর্তৃক) পরীক্ষায় পূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করবেন।

__[২]__ এই বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারায় আলোচিত হয়েছে। এখানেও আলোচ্য-বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আবারও বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে, জান্নাত এমনিতেই পেয়ে যাবে না। এর জন্য পরীক্ষার তেপান্তর অতিক্রম করতে হবে এবং জিহাদের ময়দানেও তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে দেখা হবে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার

****সূরা মুহাম্মদের ৩১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,***

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰي نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاْ اَخْبَارَكُم

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা- কাজ পরীক্ষা করে নেব।[১]

[১] আল্লাহ তাআলার প্রথম থেকেই জানা আছে। এখানে জানার অর্থ, তা বাস্তবায়িত ও সংঘটিত হওয়া। যাতে অন্যরাও জেনে এবং দেখে নেয়।
আল্লাহ তাআলা একই আয়াতে জিহাদ ও ধৈর্য ধারণকে একত্রিত করেছেন কারণ ধৈর্য ধারণ ছাড়া কখনোই জিহাদ সম্ভব নয়
সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে ***জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ***। অনেকেই জিহাদকে পরীক্ষা মনে করেন না কিন্তু জিহাদ হচ্ছে বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা । যাদের মাধ্যমে আল্লাহতালা আমাদের পরীক্ষা করেন আমাদের জানমাল আল্লাহর রাস্তায় প্রস্তুত নাকি আমরা এগুলো খরচ করতে কৃপণতা করছি বিলম্ব না করছি , জিহাদ হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ
জিহাদের পথে পা বাড়ানোর আগে জিহাদি জীবনের বাস্তবতা কে উপলব্ধি করা প্রয়োজন তাই আমাদের উচিত বর্তমান অবস্থায় জিহাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা এবং দাওয়াতি হিসেবে এই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া

জিহাদ *(جهاد)* একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ইসলামী ধারণা, যা নিয়ে রিসার্চ বা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কয়েকটি কারণে।যেমন:

১. অর্থ ও পরিপ্রেক্ষিত বোঝা:
জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়। এর মূল অর্থ *"প্রচেষ্টা" বা "সংগ্রাম"* — যা আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বা সামরিক হতে পারে। তাই, রিসার্চ ছাড়া এর প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট বোঝা কঠিন।

২. বিভিন্ন প্রকার জিহাদ : যেমন:
* নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ (আত্মসংগ্রাম)
* শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই
* অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা (সত্যের জন্য দাঁড়ানো)
* প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ

এই বিভাজনগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে রিসার্চ জরুরি।

৩. আধুনিক ভুল ব্যাখ্যার প্রতিকার:
অনেক সময় মিডিয়া বা কিছু গোষ্ঠী জিহাদকে শুধুই সহিংসতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে, যা ভুল এবং বিভ্রান্তিকর। রিসার্চ করলে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়।

৪. ইসলামী ইতিহাস ও প্রসঙ্গ বোঝা:
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে বিভিন্ন জিহাদের (বিশেষ করে গাজওয়াহগুলোর) প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও ফলাফল জানা জরুরি, যাতে বোঝা যায় ইসলাম কখন, কেন, এবং কীভাবে জিহাদের অনুমতি দেয়।

৫. ফিকহ ও শরিয়াহ অনুযায়ী শর্তগুলো জানা:
ইসলামে জিহাদ করার নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত আছে, যেমন নেতৃত্ব, উদ্দেশ্য, নিরীহদের নিরাপত্তা ইত্যাদি। এগুলো রিসার্চ ছাড়া বোঝা সহজ নয় ।

৬. আধুনিক বাস্তবতায় প্রয়োগ বোঝা:
আজকের রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদের তাৎপর্য কীভাবে প্রয়োগযোগ্য — তা বোঝার জন্য গবেষণা অপরিহার্য।

জিহাদের সঙ্গা:

জিহাদ একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ **"সংগ্রাম"** বা **"প্রচেষ্টা করা"**। ইসলামী পরিভাষায়, *জিহাদ বলতে আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল ও সামর্থ্য ব্যয় করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করাকে বোঝানো হয়।* এটি শুধু যুদ্ধের অর্থে সীমাবদ্ধ নয় বরং আত্মশুদ্ধি, সমাজসেবা, ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ইত্যাদি সকল ধরনের ইতিবাচক প্রচেষ্টাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

জিহাদের প্রকারভেদ:

জিহাদ প্রধানত চার প্রকার:

১. (জিহাদুন্নফস) নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ :

এই নাফসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. নাফসে আম্মারাহ

নাফসে আম্মারার স্বভাবগত চাহিদা এটাই যে, মন্দ কামনা, শয়তানের অনুসরণ, কু-প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা, যাতে করে হারাম কাজ করা তার জন্য সহজতর হয়। এই আত্মা সর্বদা রুহ এর সাথে যুদ্ধ করে জয়ই হয়। রুহ সর্বদা পরাজয় হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- সূরা ইউসুফ (১২:৫৩)

اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَۃٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ

নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার রব দয়া করেন

যখন মানুষ ইসলাম ও ঈমান অনুযায়ী চলে না তখন নাফসুল আম্মারাহ্ প্রভাব বিস্তার করে এবং সে পাপাচারে নিমজ্জিত হয়। যারা গান-বাজনা-অশ্লীলতা সহ বিভিন্ন পাপে লিপ্ত এবং তাতে তারা ইতস্তত বোধ করে না তাদের আত্মা নফসুল আম্মারাহ্।

২. নাফসে লাওওয়ামাহ

এ প্রকারের আত্মায়ও মন্দ, শয়তানী কুমন্ত্রণা, কুপ্রবৃত্তির বাসনা ইত্যাদি জিনিসের উদয় হয়; তবে পরক্ষণেই এই নাফসের অধিকারী ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অধিক ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে, অনুশোচনা প্রকাশ করে, অনুতপ্ত হয় ও লজ্জাবোধ করে। কেননা তাতে সামান্যতম হ’লেও ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন- **সূরা ক্বিয়ামাহ(৭৫:১-২)।**

وَ لَاۤ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَۃِ – لَاۤ اُقۡسِمُ بِیَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ ۙ

‘আমি শপথ করি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই আত্মার, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়’

এই নফস মাঝে মাঝে রুহ এর সাথে যুদ্ধ করে জয়ই হয় আবার মাঝে মাঝে রুহ জয়ই হয়। এই নাফসের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ভালও করেন, আবার মন্দও করেন। তবে, পার্থক্য

যে, মন্দ কাজ করার পর পরই অনুশোচনা বা বিবেকের দংশণে জর্জরিত হন। অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদের আল্লহপাক হয়তো ক্ষমা করে দিবেন, অথবা মন্দকর্মের ফল যতটুকু হয় তা পৃথিবীতে বা পরকালে দিয়ে মুক্তিদান করবেন। যখন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে এবং তওবা করে। যখন কেউ ইসলাম জানতে ও মানতে শুরু করে তখন নাফসুল লাওয়ামা প্রভাব বিস্তার করে এবং সে অন্যায় করতে বিব্রত বোধ করে। এটা হল মানুষের শুদ্ধতার প্রাথমিক অবস্থা।

৩. নাফসে মুত্বমাইন্নাহ

এই প্রকারের আত্মা আল্লাহর আনুগত্য ও যিকর দ্বারা মনে প্রশান্তি অনুভব করে। সকল প্রকার আনুগত্যের কর্মকান্ড সম্পাদন করে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভ করে এবং সমস্ত অন্যায় ও সীমালংঘন থেকে সে পরিপূর্ণ রূপে মুক্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-**সূরা ফাজর(৮৯:২৭-২৮)**

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّةُ - ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً

'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি প্রশান্তচিত্তে তোমার পালনকর্তার দিকে ফিরে চলো।

এই আত্মা সবসময়ে রুহ এর সাথে যুদ্ধ করে পরাজয় হয়। সত্য বা রুহ সর্বদা জয়ই হয়। একজন মুসলমান দাবীকার ব্যক্তির নাফসে মুত্বমাইন্নাহ থাকা উচিত।সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি তার আত্মার পরিশোধনে এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিবিষ্ট হ'তে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। নিজের খারাপ প্রবৃত্তি, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এটি সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। যেমন:

ক. পাপ ও গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা:

যেমন: মিথ্যা বলা, অন্যায় কাজ করা, হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা।

খ. আল্লাহর আদেশ পালন করা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা:

নিয়মিত সালাত, রোজা, জাকাত পালন ও গীবত, পরনিন্দা, অন্যায় কথা থেকে দূরে থাকা।

গ. আত্মা ও চরিত্র শুদ্ধ করা:আত্মসংযম, বিনয়, ধৈর্য, সহনশীলতা অর্জন করা।

ঘ. জ্ঞান ও ঈমানের বৃদ্ধি:কুরআন, হাদীস, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং আমল করার চেষ্টার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি সাধন।

ঙ. ইলমে দ্বীন হাছিল করে :পবিত্র কুরআনের **সূরা যুমার (৩৯:৯)** বলা হয়েছে

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'

আমরা মানুষ, সৃষ্টির সেরাজীব আশরাফুল মাখলুকাত। জন্মগতভাবে অন্য প্রাণিদের মতো-ই প্রাণি। তবে অন্যান্য প্রাণি ও আমাদের মাঝে পার্থক্য হলো, 'জ্ঞান থাকা' বা 'না থাকা'। আমাদের খেয়ে-ধেয়ে শুধু জীবনযাপন করলেই হয়না, অর্জন করতে হয় জ্ঞান, হতে হয় জ্ঞানী। আর আমাদের আরেকটি সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো, আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের ধর্ম ইসলামে প্রতিটি মানুষকে বলা হয়েছে জ্ঞান অর্জন করার কথা। ইলমে দ্বীন হাছিলের মাধ্যমে আমরা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের নিকট অবতীর্ণ অহী-র সূচনা হয়েছিল 'পড়' নির্দেশের মাধ্যম। **আল্লাহ বলেন, সূরা আলাক্ব(৯৬:১)**

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ

পড়! তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' ।

আর এই ইলমে দ্বীনের প্রধান উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ।
নাফসের স্রষ্টা অবশ্যই নাফস সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন। ভাল আত্মা ও খারাপ আত্মা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত। এজন্য তাঁরই প্রেরিত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ মানবাত্মার অন্যতম গাইড বুক হিসাবে বিবেচিত।
নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এমন এক ধারাবাহিক আত্মসংগ্রাম যা একজন মুসলিমের সারাজীবনের কাজ। এটি বাহ্যিক যুদ্ধের চেয়েও অধিক মূল্যবান।
কিতাবুল্লাহর অনুসরণ ও রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর অনুকরণের মাধ্যমে যখন আমরা ইলমে দ্বীন অর্জনে সচেষ্ট হব, তখন এতদুভয়ের সমন্বয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগে আত্মনিয়োগ করতে পারব।
আল্লাহ ইরশাদ করেন, (সূরা বাক্বারাহ ২:২)

ذٰلِکَ الۡکِتٰبُ لَا رَیۡبَ ۚۖۛ فِیۡہِ ۚۛ هُدًی لِّلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ

এটা এমন একটা কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথ প্রদর্শক'
।

চ. আমলে সালেহ :

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে চলাফেরা ও আমলের ক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে সে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবী আবাদ করার জন্য সেখানে বিচরণ করে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে আহবান করেছেন। তাকে আমলে সালেহের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন তার সাক্ষাৎ লাভের ঘোষণা দিয়েছেন। **আল্লাহ বলেন, সূরা ইনশিক্বাক(৮৪:৬)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ۞

'হে মানুষ তোমাকে তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ পাবে' ।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'তোমাকে তোমার রবের সাক্ষাৎ পেতে অত্যন্ত সাধনার মাধ্যমে আমলে ছালেহ সম্পাদন করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করলে নেককার হিসাবে তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। আর বদ কাজ করলে বদকার হিসাবে তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে'। সুতরাং নিজেকে আমলে ছালেহ এর উপরে দৃঢ় রাখার মাধ্যমে নফসের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

ছ. দাওয়াতে ইল্লাহ করে :আল্লাহর দিকে আহবানের মাধ্যমে জিহাদে নিমগ্ন হওয়া। অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **সূরা তওবা(৯:১২২)**

وَ لِيُنۡذِرُوۡا قَوۡمَهُمۡ اِذَا رَجَعُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُوۡنَ۞

'যখন তারা স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন যেন তাদেরকে সতর্ক করে, তাহ'লে তারা বাঁচতে পারবে' ।

রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেন, ***বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) হাদিস/৩৪৬১***

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়।

জ.*ধৈর্যধারণ করে:ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় আসে। ধৈর্যধারণ করাটাও নাফসের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হলে বিপদাপদে ধৈর্যশীল হ'তে হবে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে ইলম হাছিলের ক্ষেত্রে, আমলে ছালেহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে। তায়েফের জনগণকে*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরই কল্যাণের জন্য আহবান করেছিলেন। অথচ তিনি মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসলেন; কিন্তু ধৈর্যহারা হলেন না। বাতিলপন্থীরা অন্যায়ের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারলে, হকপন্থীদের আরো বেশী ধৈর্যধারণ করা উচিত। অতএব জিহাদের ময়দানে টিকে থাকতে হ'লে অবশ্যই ধৈর্যের সাথে ইলম, আমল, দাওয়াত ও তাবলীগে নিবিষ্টচিত্তে মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যথায় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে শামিল হ'তে হবে।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) *-এর এ কথার ব্যাখ্যা হ'ল, প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদন করে। তাদের কেউ স্রেফ আল্লাহর আনুগত্যেই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। ফলে আল্লাহ তাকে আযাব থেকে মুক্ত করেন। আর কোন মানুষ শয়তানের অনুসরণ করে, তার খেয়াল-খুশিমত জীবন পরিচালনা করে। ফলে সে শয়তানের সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গী হয়ে ধ্বংসে নিপতিত হয় এবং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে'।*

আল্লাহ বলেন, সূরা আসর (১০৩:১-৩)

–اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ – اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ– وَ الۡعَصۡرِ

সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।

সবর তিন প্রকার-

(১) বিপদে সবর করা (২) পাপ থেকে সবর করা অর্থাৎ বিরত থাকা (৩) আল্লাহর আনুগত্যেসবর করা অর্থাৎ দৃঢ় থাকা।

*প্রথমটি **'আম'** বা **সাধারণ**। দ্বিতীয়টি **'হাসান'** বা **সুন্দর** এবং তৃতীয়টি **'আহসান'** বা **সবচেয়ে সুন্দর।***

অতএব নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যেকোন খারাপ ও পাপকর্ম হতে বিরত থেকে হক্কের উপরে নিজেকে দৃঢ় রাখার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করা

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ:
'শয়তান' হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। তার নাম ছিল ইবলিস, তাকে ইবলিস ও বলা হয়। ইবলিসকে তার জ্ঞান এবং যোগ্যতার জন্য ফেরেশতা উপাধি দেয়া হয় আর তার নতুন নাম দেয়া হয় আজাজিল ("আল্লাহ্ শক্তিদানকারী")

শয়তান সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের সুরা ইয়াসিন(৩৬:৬০) এ বলেছেনঃ

اَلَمۡ اَعۡهَدۡ اِلَیۡکُمۡ یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ اَنۡ لَّا تَعۡبُدُوا الشَّیۡطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ

"হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না(১), কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?"

এছাড়াও পবিত্র কুরআনে,**সুরা বাকারা আয়াত (২:২০৮)** তে আল্লাহ বলেছেন

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِی السِّلۡمِ کَآفَّۃً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّیۡطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।
কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনায় পদাঙ্ক অনুসরণের একাধিক ব্যাখ্যা এসেছে-
আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- শয়তানের 'পদাঙ্ক অনুসরণ' দ্বারা উদ্দেশ্য তার পথ, কর্মপদ্ধতি আর সে যে কাজের নির্দেশ দেয়; সে অনুযায়ী কাজ করা।হজরত কাতাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রতিটি পাপের কাজই শয়তানের পদাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত ' ***(তাফসিরে ইবনে কাসির)***

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে ঈমান ও তাকওয়া দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শয়তানের ধোঁকা, ওয়াসওয়াসা বা মনের কু-প্ররোচনা, ও পাপের দিকে টেনে নেওয়া পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই বা আত্মসংগ্রাম করা। এটি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং অভ্যন্তরীণ জিহাদের একটি প্রধান অংশ। যেমন:

ক. ওয়াসওয়াসা (মনের কুপ্রবণতা) থেকে বাঁচার চেষ্টা করা:শয়তান মানুষের মনে পাপাচারের চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। সেই চিন্তা বা প্ররোচনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াই জিহাদ।

খ. সৎ ও ন্যায়পথে অটল থাকা:শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাই কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে সঠিক পথে থাকা শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ।

গ. আল্লাহর সাহায্য চাওয়া ও জিকিরে লিপ্ত থাকা:শয়তান দূরে থাকে যখন মানুষ আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে। তাই জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, ও ইবাদতের মাধ্যমে শয়তানকে দুর্বল করা হয়।

ঘ. সাহস ও ইমানের দৃঢ়তা অর্জন:
শয়তান মানুষের মনকে দুর্বল করতে চায়। ইমান শক্তিশালী করলে শয়তানের কুমন্ত্রণাকে প্রতিহত করা যায়।_***(সূরা ফাতির ৩৫:৬)***

ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর।[১] সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।

[১] অর্থাৎ, তাকে কঠিন শত্রুই মনে কর, তার মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজি থেকে ঐরূপ বাঁচার চেষ্টা কর, যেমন শত্রুর কবল থেকে বাঁচার জন্য মানুষ চেষ্টা করে থাকে। অন্য স্থানে উক্ত বিষয়কে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) *অর্থাৎ, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শত্রু? সীমালংঘনকারীদের পরিবর্তন কত নিকৃষ্ট!* ***(সূরা কাহ্ফ ১৮:৫০ আয়াত)***

৩. (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) কাফের ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ :
ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও ইসলামের প্রচারের জন্য শারীরিক ও অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করা। তবে এটি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষ ও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুমোদিত হতে হয়।ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্বেষ, নির্যাতন বা বাধা সৃষ্টি করে—তাদের

বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা বা ইসলাম প্রচারে কৌশলী ও ন্যায়ভিত্তিক সংগ্রাম। এটি কেবল যুদ্ধ নয়, বরং এর ভেতর আছে দাওয়াত, যুক্তি-প্রমাণ, শিক্ষা ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন দিক। যেমন:

ক. দাওয়াত ও যুক্তি দিয়ে জিহাদ:কুরআনের মাধ্যমে যুক্তি ও সদ্ব্যবহারে ইসলাম প্রচার করা।

খ. রাজনৈতিক বা কৌশলগত জিহাদ:এমন কাফের রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের উপর হামলা চালায় বা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে।

- সশস্ত্র প্রতিরোধ (যুদ্ধ):এটি সর্বশেষ ধাপ এবং কেবল তখনই বৈধ যখন মুসলমানদের উপর সরাসরি আক্রমণ, দমন-পীড়ন, বা নির্মূলের হুমকি আসে।

(সূরা বাকারা, ২:১৯০)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না।[১] নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

[১] এই আয়াতে প্রথমবার সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। আর 'বাড়াবাড়ি করো না'র অর্থ হল, শত্রুর আঙ্গিক বিকৃতি ঘটায়ো না, মহিলা, শিশু এবং এমন বৃদ্ধকে হত্যা করো না, যে যুদ্ধে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেনি। অনুরূপ গাছ-পালা বা ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং কোন অভীষ্ট লাভ ছাড়াই পশু-হত্যা করা ইত্যাদিও বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে, যা থেকে বিরত থাকতে হবে। (ইবনে কাসীর)

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্বেষ, নির্যাতন বা বাধা সৃষ্টি করে—তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষ থেকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা বা ইসলাম প্রচারে কৌশলী ও ন্যায়ভিত্তিক সংগ্রাম। এটি কেবল যুদ্ধ নয়, বরং এর ভেতর আছে দাওয়াত, যুক্তি-প্রমাণ, শিক্ষা ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন দিক।

৪. জিহাদ বিল ক্বলম ও বিল লিসান (কলম ও মুখের জিহাদ):

কলম, জ্ঞান ও কথার মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ, সত্যের প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা।ইসলামের দাওয়াত, ইসলামী জ্ঞান প্রচার, ইসলামবিদ্বেষের জবাব, ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করা।বই, প্রবন্ধ, সংবাদ, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্য তুলে ধরা।

জিহাদ বিল ক্বলম অর্থ **"কলম" বা লেখার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার প্রতিবাদ করা।**

ইসলামের দাওয়াত, ইসলামী জ্ঞান প্রচার, ইসলামবিদ্বেষের জবাব, ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করা।

বই, প্রবন্ধ, সংবাদ, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্য তুলে ধরা।

কুরআন থেকে দৃষ্টান্ত

(আল ফুরকান ২৫:৫২)

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর। [১]

*[১] جاهدهم به এর ه (এ) সর্বনাম দ্বারা **কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত** করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়নি। সেই কারণে এর অর্থ হবে কুরআনের আদেশ নিষেধকে প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা কর এবং কাফেরদের জন্য যেসব শাস্তির ধমক ও তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট কর।*

জিহাদ বিল লিসান অর্থ **ভাষণ, কথাবার্তা বা দাওয়াতের মাধ্যমে সত্যের জন্য সংগ্রাম।**

ইসলাম প্রচারে বক্তৃতা, বিতর্ক, উপদেশ, মিডিয়া ও জনমত গঠন।ইসলামের ভুল ধারণার প্রতিবাদ ও শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।এই দুইটি জিহাদই বর্তমান যুগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর মাধ্যম, বিশেষত মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগে।

জিহাদের গুরুত্ব:

"জিহাদ" শব্দটি আরবি ***"জাহাদা"*** ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো "পরিশ্রম করা", "সংগ্রাম করা" বা "চেষ্টা চালানো"। কোরআন ও হাদিসে জিহাদ শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে সবকটিই কোনো না কোনো ন্যায় ও কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ বোঝায়।

ইসলামে জিহাদ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত। কুরআন ও হাদিসে বহু স্থানে জিহাদের কথা এসেছে:

কুরআনে বলা হয়েছে:

**** (সূরা আনকাবুত, ২৯:৬৯)***

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে,[১] আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করব ।[২] আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।" [৩]

[১] অর্থাৎ, যারা আমার (সন্তুষ্টির পথে) দ্বীনের উপর আমল করতে কষ্ট, পরীক্ষা এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়।

[২] এর অর্থ হল, দুনিয়া ও আখেরাতের ঐ সকল পথ, যে সকল পথে চললে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

[৩] 'ইহ্সান'-এর অর্থ হল, 'আমি যেন আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন' মনে করে প্রত্যেক সৎ কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করা। নবী (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সে কাজ সম্পাদন করা। মন্দের প্রতিশোধে মন্দ না করে ভালো ব্যবহার প্রদর্শন করা। নিজের প্রাপ্য অধিকার ছেড়ে দেওয়া এবং অন্যকে তার অধিকার অপেক্ষা অধিক দেওয়া। এই সকল কর্ম 'ইহ্সান' (সৎকর্মপরায়ণতা)র অন্তর্ভুক্ত।

**** সূরা বাক্বারা ২:২১৬***

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤي اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤي اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۟

তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।[১]

[১]জিহাদের নির্দেশের একটি উপমা পেশ করে ঈমানদারদের বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল কর, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় ও ভারী মনে হয়। কারণ, এর পরিণাম ও ফলসমূহ কেবল আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। হতে পারে এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যেমন, জিহাদের ফলস্বরূপ তোমরা লাভ করবে বিজয়, সাফল্য, মর্যাদা-সম্মান এবং শীর্ষস্থান ও (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ-সামগ্রী। পক্ষান্তরে তোমরা যেটা পছন্দ কর (অর্থাৎ, জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা), তার ফল তোমাদের জন্য অতীব বিপজ্জনক হতে পারে। অর্থাৎ, শত্রু তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে হবে।

**** আল-আনফাল ৮:৬০***

وَاَعِدُّوۡا لَہُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّمِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡہِبُوۡنَ بِہٖ عَدُوَّ اللّٰہِ وَعَدُوَّکُمۡ وَاٰخَرِیۡنَ مِنۡ دُوۡنِہِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَہُمۡ ۚ اَللّٰہُ یَعۡلَمُہُمۡ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ یُوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ۝

আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।[১]

[১] قُوَّة (শক্তি) শব্দের ব্যাখ্যা নবী (সাঃ) হতে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেছেন, শক্তি হল, (তীর) নিক্ষেপ। (মুসলিমঃ ইমারাহ অধ্যায় এবং আরো অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ)কেননা, সে যুগে তীরই ছিল যুদ্ধের বড় অস্ত্র এবং তীর মারায় দক্ষতা অর্জন ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা। (যেহেতু তাতে দূর থেকেই শত্রু নিপাত করা যায়।) যেমন যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ছিল অপরিহার্য ও অতীব প্রয়োজনীয় একটি মাধ্যম, যে কথা আলোচ্য আয়াতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে যুদ্ধে তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়ার সেই গুরুত্ব এবং উপকারিতা বাকী নেই।

এই জন্য 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত কর' এই নির্দেশ পালনে অধুনা যুগের যুদ্ধাস্ত্র (যেমন, ক্ষেপণাস্ত্র; রকেট, মিসাইল, ট্যাঙ্ক, কামান, বোমারু বিমান এবং সামুদ্রিক যুদ্ধের জন্য সাবমেরিন প্রভৃতি) এর প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক।

**** আলে-ইমরান ৩:১৪২***

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

***তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে,[১] যতক্ষণ* না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন! [২]**

[১] অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে এবং কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? না, বরং জান্নাত তারাই লাভ করবে, যারা (আল্লাহ কর্তৃক) পরীক্ষায় পূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করবেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

[২] এই বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারায় আলোচিত হয়েছে। এখানেও আলোচ্য-বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আবারও বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে, জান্নাত এমনিতেই পেয়ে যাবে না। এর জন্য পরীক্ষার তেপান্তর অতিক্রম করতে হবে এবং জিহাদের ময়দানেও তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে দেখা হবে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারছ, না পারছ না?

***সূরা হজ – ২২:৭৮**

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۗ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۗ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَي النَّاسِ ۖۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۗ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; [১] তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; [২] তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ মেনে চল);[৩] তিনি[৪] পূর্বে

তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য।[৫] সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

[১] *এই 'সংগ্রাম' বলতে কেউ কেউ সেই বৃহৎ 'জিহাদ' উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা আল্লাহর কালেমা ও দ্বীনকে উন্নত করার জন্য কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে করা হয়। আবার কেউ কেউ আল্লাহর আদেশাবলী মান্য করার অর্থ নিয়েছেন; যেহেতু তাতেও 'নাফসে আম্মারাহ' (মন্দপ্রবণ মন) ও শয়তানের মুকাবিলা করতে হয়। আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হল প্রত্যেক সেই চেষ্টা-চরিত্র, যা হক ও সত্যের শির উন্নত এবং বাতিল ও অন্যায়ের শির অবনত তথা চূর্ণ করার জন্য করা হয়।*

[২] *অর্থাৎ, এমন আদেশ নেই, যা মান্য করা অত্যন্ত কষ্টকর (তবে প্রতিটি কর্মেই এক-আধটুকু কষ্ট তো করতেই হয়)। বরং পূর্ববর্তী শরীয়তের কিছু কঠিন আদেশ রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং মুসলিমদের জন্য এমন অনেক সহজতা দান করা হয়েছে; যা পূর্ববর্তী শরীয়তে ছিল না।*

[৩] *আরব জাতি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিল। সেই হিসাবে ইবরাহীম (আঃ) হলেন আরববাসীর পিতা। আর অনারবরাও ইবরাহীম (আঃ)-কে একজন উচ্চ সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করত; যেমন পুত্র তার পিতাকে শ্রদ্ধা করে থাকে। সেই হিসাবে তিনি সকলের আদি পিতা ছিলেন। এ ছাড়াও ইসলামের নবী (আরবী হওয়ার কারণে) ইবরাহীম (আঃ) তাঁরও পিতা ছিলেন। আর এই জন্য তিনি সকল উম্মতে মুহাম্মাদীরও পিতা হলেন। এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এটাই হল ইসলাম ধর্ম; যা মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন; যা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীমেরই ধর্ম। অতএব তোমরা সেই ধর্মের অনুসারী হও।*

[8]هُو□ *(সে বা তিনি) শব্দটি দ্বারা কেউ কেউ বলেন, ইবরাহীমকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইবরাহীম (আঃ)-ই তোমাদের 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ)ই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম'।*

[৫] এই সাক্ষ্যদান কিয়ামতের দিন হবে; যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। ***(সূরা বাকারার ২:১৪৩ নং আয়াতের দ্রষ্টব্যে)***

*** সূরা তাওবা – ৯:৪১**

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

দুর্বল হও অথবা সবল, সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও[১] এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

[১] এর নানা অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, একাকী হও কিম্বা দলবদ্ধভাবে, খুশী হয়ে অথবা অখুশী হয়ে, গরীব হও অথবা আমীর, যুবক হও অথবা বৃদ্ধ, পায়ে হেঁটে হোক অথবা সওয়ার হয়ে, সন্তানবান হও অথবা সন্তানহীন, সৈন্যদলের অগ্রে থাকো অথবা পিছনে। ***ইমাম শওকানী (রঃ)*** *বলেন, আয়াতটি এই সমস্ত অর্থের জন্য ব্যাপক হতে পারে। যেহেতু আয়াতের অর্থ এই যে, "তোমরা জিহাদে বের হও; চাহে তা তোমাদের জন্য ভারী মনে হোক অথবা হালকা।" আর এই অর্থে উল্লিখিত সমস্ত অর্থ এসে যায়।*

- **আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত,**

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
"জিহাদের একটি মুহূর্ত, রাত বা দিন অতিবাহিত করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ধনসম্পদের চেয়ে উত্তম।"
— (বুখারী, হাদীস: ২৭৯২)

- **মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত :**

তাবুক থেকে ফিরবার পথে আমরা রাসূলুল্লাহর(সা:) সাথে ছিলাম । তিনি আমাকে বললেন:" তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি বিষয়ের প্রধান এর স্তম্ভ ও এর চূড়া সম্বন্ধে বলতে পারি"। আমি বললাম: "জ্বী ইয়া রাসুলুল্লাহ(সা:)",তিনি বললেন," ইসলাম হচ্ছে বিষয়টির প্রধান সালাত হচ্ছে স্তম্ভ এবং জিহাদ হচ্ছে এর চূড়া।"
সহীহ বুখারী- ভলিউম-৪,বই- ৫২,নং- ৪৪

- <u>যায়েদ ইবনে আসলাম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,</u> *রাসূলুল্লাহ (সা:)বলেছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত আসমান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্তই সতেজ ও চির সবুজ রূপে জিহাদ চলবে ।আর মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের মধ্যকার কুরআন তেলাওয়াতকারীরা বলবে: 'এখন জিহাদের সময় নয়' অতএব, যে কেউ সেই সময়ে থাকবে, জিহাদের জন্য সেটা সর্বোত্তম সময়।" তারা বলল :"ইয়া রাসুলুল্লাহ! সত্যই কি কেউ এমন বলবে ?" তিনি বললেন:" হ্যাঁ, তার ওপর আল্লাহর লা'নত এবং ফেরেশতাকুল ও সমগ্র মানবজাতির লা'নত।"<u>[উসূল-আস সুন্নাহ মুরসালানে ইবনে যামনীন কর্তৃক বর্ণিত এবং আনাস রা. থেকে ইবনে আসাকির মারফুয়ান কর্তৃক বর্ণিত]</u>*

জিহাদের গুরুত্বের দিকসমূহ:

দিক	বর্ণনা
আত্মশুদ্ধি	নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মা পবিত্র হয়
সামাজিক দায়িত্ব	মজলুমদের রক্ষা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, শান্তি প্রতিষ্ঠা
ইসলামের প্রচার	দাওয়াত, যুক্তি, কলম ও ভাষার মাধ্যমে ইসলামের সেবা
সাহস ও আত্মত্যাগ	আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ, সম্পদ ও সময় উৎসর্গ

জিহাদের শ্রেণিবিভাগ :

১. আত্মিক জিহাদ (নফসের বিরুদ্ধে):
নিজেকে পাপ, লোভ, হিংসা, অহংকার, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর পথে চলার চেষ্টাকে বলা হয় আত্মিক জিহাদ। এই জিহাদ প্রতিদিন করতে হয় এবং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জিহাদ:
ইসলামের জ্ঞান ও আদর্শ প্রচার করা, ভুল তথ্যের জবাব দেয়া, ইসলামী সাহিত্য, শিক্ষা ও মিডিয়ায় অবদান রাখা। আজকের দিনে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক জিহাদ:
গরীব ও অভাবীমানুষের পাশে দাঁড়ানো, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

৪. শারীরিক জিহাদ (সামরিক জিহাদ):
যখন মুসলমানদের উপর নির্যাতন হয়, তাদের দেশ বা ধর্ম আক্রান্ত হয় — তখন প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নেওয়া। এটি সর্বশেষ পর্যায়ের জিহাদ, এবং তা শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও ইসলামী নেতৃত্বের অনুমতিক্রমেজিহাদের গুরুত্ব কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে:

**** আস-সাফ ৬১:৪***

اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الَّذِیۡنَ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِہٖ صَفًّا کَاَنَّہُمۡ بُنۡیَانٌ مَّرۡصُوۡص ٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।[১]

[১] এখানে জিহাদকে একটি বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ নেক কাজ বলা হয়েছে; যা আল্লাহর নিকট অনেক প্রিয় আমল।

**** আন-নিসা ৪:৯৫***

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰي ؕ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَي الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়।[১] নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন [২] এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

*[১] যখন এই আয়াত নাযিল হল যে, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারা এবং যারা বাড়ীতে অবস্থান করে তারা পরস্পর সমান নয়', তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) (অন্ধ সাহাবী) প্রভৃতিরা অভিযোগ করলেন যে, আমরা তো অক্ষম, যার কারণে আমরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য ছিল, ঘরে অবস্থান করার কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের সমান আমরা নেকী ও সওয়াব অর্জন করতে পারব না, অথচ আমাদের ঘরে অবস্থান স্বেচ্ছায় এবং জান বাঁচানোর জন্য নয়, বরং শরয়ী কারণেই। তাই মহান আল্লাহ [غَيْرُ أُولى الضَّرَر] (যারা অক্ষম নয়) কথাটি নাযিল করলেন। অর্থাৎ, যারা সঙ্গত ওজরের কারণে বাড়ীতে অবস্থান করে, তারাও মুজাহিদদের মত নেকীতে সমান সমান শরীক থাকবে। কারণ, (حَبَسَهُمُ العُذْر) "**ওজরই** তাদের পথে বাধা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়ঃ)*

[২] অর্থাৎ, জান ও মাল সহ জিহাদে অংশ গ্রহণকারীরা বৈশিষ্ট্য লাভের অধিকারী হবে। আর জিহাদে যারা অংশগ্রহণ করতে পারে না, তারা এই বৈশিষ্ট্য লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও মহান আল্লাহ উভয়কেই উত্তম প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এটাকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করে উলামারা বলেছেন যে, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ 'ফারযে আ'ইন'(যা করা সকলের উপর ফরয) নয়, বরং 'ফারযে কিফায়াহ' (যা উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ লোক করলেই হয়)। অর্থাৎ, যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন সে পরিমাণ লোক জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেই মনে করে নেওয়া হবে যে, সেই অঞ্চলের অন্য লোকদের পক্ষ হতে এই ফরয আদায় হয়ে গেছে।

বৈধ।

***দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক দিক-নির্দেশনা দানকারী ইমাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূল (সাঃ) সালামের প্রতি যিনি ঘোষণা দিয়েছেন**

"সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করে) নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হয়ে ,আবার জীবিত হই, আবার নিহত হয়।"

অনুরূপ শব্দ দ্বারা আল বুখারী (৩৬,২৭৯৭,৭২২৬) এবং মুসলিম (১৮৭৬)-এ বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন,

"তোমরা আমল করতে থাকো, কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ,তার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেয়া হবে।"

অনুরূপ শব্দ দ্বারা আল বুখারী (৪৯৪৯,৭৫৫১)মুসলিম (২৬৪৭,২৬৪৯) বর্ণিত হয়েছে

"জিহাদ" ইসলামে এমন একটি মৌলিক শিক্ষা যা মানুষের আত্মশুদ্ধি, সমাজ সংস্কার, ইসলামের প্রচার এবং মজলুমদের রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি কেবল যুদ্ধ নয়, বরং একটি সার্বিক জীবনব্যবস্থা ও নৈতিক সংগ্রামের নাম এবং মুজাহিদের জন্য জান্নাতের অগ্রাধিকার।

জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত

'জিহাদ' অর্থ **প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম** ইত্যাদি।[1]

আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে।[2]

যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[3]

হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[4]

আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে।[5] তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্বেহ জিহাদ বলতে ''কিতাল'' বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে।[6]

কতল অর্থ **হত্যা করা**। আর **কিতাল** অর্থ **পরস্পরে যুদ্ধ**। এজন্য জিহাদ বা কিতালের **মূল শর্ত হলো সামনাসামনি 'যুদ্ধ'**। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়।

মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ **(সাঃ)....**এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেননি বা করার অনুমতি প্রদান করেননি। দুই-একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সামরিক নেতা বা মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন ''কমান্ডো'' অভিযান পারিচালনা করার অনুমতি দেন তিনি। কাব ইবনু আশরাফ ও আবূ রাফি সালাম ইবনু আবিল হুকাইক-এর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে কমান্ডো অভিযান ছিল এ পর্যায়ের। এরূপ অভিযানের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বাহিনী ও শত্রু বাহিনী উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন।[7] রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এরূপ কমান্ডো হামলা ছাড়া অন্য কোনোভাবে যুদ্ধের ময়দান ও বিচার ছাড়া তিনি হত্যার অনুমতি দেন নি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

কিতাল বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক শর্ত আরোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি, (২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও (৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।

(১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন:

ইসলামে জিহাদের বৈধতার সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম 'দা'ওয়াত' বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ **(সাঃ)** দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। দাওয়াতের বিরুদ্ধে অমানবিক বর্বরতা ও সহিংস প্রতিরোধকে তিনি পরিপূর্ণ অহিংস উত্তম আচরণ দিয়ে মুকাবিলা করেছেন। আবূ বাকর, উমার, উসমান, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ ও মক্কার আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় সামাজিক নেতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সাথে সাধারণ অনেক মুসলিম ছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাসুলুল্লাহ **(সাঃ)**এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন কাফিরদের সহিংস আচরণকে প্রতিরোধ করতে বা তাদের বর্বরতার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিতে। কিন্তু কখনোই সে অনুমতি দেওয়া হয় নি। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ **(সাঃ)**-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুশরিকগণ এ নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ **(সাঃ)** বলেন:

إنما الإمامُ جُنةٌ . يُقاتلُ من ورائه

"রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[8]

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে যুদ্ধ বা কিতালে লিপ্ত হন নি। **আলী (রা)**-এর সাথে **মু'আবিয়া (রা)**-এর যুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। **আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা)** ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। এ সকল বৈধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, সেজন্য সাহাবীগণ সাধারণত এগুলিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করতেন। আমরা দেখেছি যে, আলী (রা)-এর সময়ের যুদ্ধে **৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন** বলে জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন, যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। **৭৩ হিজরীতে** হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি **আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলে,**

إنَّ الناسَ ضَيَّعوا وأنتَ ابنُ عُمَرَ، وصاحبُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما يَمنَعُكَ أن تَخرُجَ ؟ فقال : يَمنَعُني أنَّ الله حَرَّمَ دمَ أخي

وفي رواية: ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت

মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসুলুল্লাহ ***(সাঃ)****এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, এ-ই আমাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।" অন্য বর্ণনায় তারা বলে, "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন?" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, "ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের* ***(সাঃ)*** *উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।"****[9]***

এখানে **আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)** জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[10] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

এছাড়া জিহাদ আরকানে ইসলামের মত মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, বরং তা উদ্দিষ্ট ইবাদতগুলি পালনের উপকরণ মাত্র। জিহাদের মাধ্যমে মূল ইবাদগুলি পালনের পরিবেশ রক্ষা করা হয়। পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আর জিহাদের প্রয়োজন থাকে না। উদ্দিষ্ট ইবাদত কখনো স্থগিত হয় না; উপকরণ স্থগিত হতে পারে। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত সর্বদা সর্বাবস্থায় পালনীয়। পক্ষান্তরে "জিহাদ" কেবলমাত্র এ সকল ইবাদত পালনের বিঘ্ন ঘটলেই পালনীয়। সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত, যিক্র ইত্যাদি কর্ম সরাসরি ইবাদত। মুমিন যত বেশি পালন করবেন ততবেশি সাওয়াব লাভ করবেন। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মত ইবাদত। এক্ষেত্রে যত বেশি অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে তত বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান ইবাদত বা দায়িত্বে পরিণত হয়। এজন্য ইসলামে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং সামান্যতম সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই জিহাদ এড়ানোর জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার **"উপকরণ"।** প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার। জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে,

তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, ভুল জিহাদের মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়।

এভাবে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেননি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।’’ সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেন নি যে, *খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেননি।[11]*

২) রাষ্ট্র বা মুসলিমের নিরাপত্তা:

কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। **মহান আল্লাহ বলেন:**

সূরা হজ্জ(২২:৩৯)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

‘যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।’’[12]

মুসলিম রাষ্ট্রের ও নাগরিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও অন্যদেশের নির্যাতিত মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও জিহাদের প্রয়োজনে হতে পারে। যদি অন্য দেশের মুসলিম নাগরিকগণ কোনো মুসলিম দেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সে দেশের সাথে মুসলিম দেশের কোনো চুক্তি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রয়োজনে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে বা তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে। **আল্লাহ বলেন:**

সূরা আনফাল (৮:৭২)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমন এনছে, হিজরত করেছে (অমুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে) এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা একে অপরের অভিভাবক-বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের (সাহায্যের) কোনোরূপ দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দীনের বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এরূপ জাতির বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[13]

(৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ:

আমরা দেখেছি যে, জিহাদ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের পরিবেশ রক্ষার উপকরণ। জিহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র, নাগরিক ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য যদি জিহাদ ছাড়া অর্জিত হয় তবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। **আল্লাহ বলেন:**

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[14]

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, দাওয়াতের প্রসার ও দীনের বিজয়ে জিহাদের চেয়েও সন্ধির অবদান ছিল অনেক বেশি। জাগতিক বিচারে এ সন্ধি ছিল অপমানজনক, অবমাননাকর এবং কাফিরদেরকে সকল ছাড় দেওয়া। যে কোনো আবেগী বিচারে এ ছিল "সব কিছু মেনে নেওয়া"। উমার (রা) ও অধিকাংশ সাহাবীই এরূপ ভেবেছেন। এ সময়ে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল অধিকার তাদের ছিল এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কাফিরদের সকল দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি করেছেন। আর ইসলামের কোনো জিহাদ, গাযওয়া, যুদ্ধ, অভিযান বা বিজয়কে "ফাতহ মুবীন" বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয় নি। কিন্তু এ "সব কিছু মেনে নেওয়ার" সন্ধিকে কুরআনে "ফাতহ মুবীন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্ধি ও শান্তি রক্ষায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এর একটি প্রকাশ হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষার্থে নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এ ছিল এমন একটি সিদ্ধান্ত যা প্রায় সকল সাহাবীকে বিক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ চুক্তি রক্ষায় অনড় ছিলেন। সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবূ জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শর্ত মেতাবেক তাকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবূ বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ(সাঃ) তাকেও ফিরিয়ে দেন। একপর্যায়ে আবূ বাসীর (রা), আবূ জানদাল (রা) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে ‘ঈস’ নামক স্থানে সমবেত হন। সন্ধিচুক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর মদীনা রাষ্টের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছি। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলির উপর আক্রমন চালাতে থাকেন। মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্টের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিচুক্তির সংশি-ষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।[15]

এভাবে সকল প্রকার আবেগ ও বেদনা নিয়ন্ত্রণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্ধি ও শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ বা হত্যা এড়িয়ে শান্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শান্তির সুযোগ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুবাহিনীকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া বা কর প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে, যুদ্ধ চলাকালে একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কোনো শত্রু সৈন্য নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। বস্তুত একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করারএকান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

(৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত:

কিতালের অন্য শর্ত, শুধু যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[16]

এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ:

لا تغدروا ولا تمثلواولا تقتلوا وليداً ولا اصحاب الصوامع ... ولا راهبا ... ولا امرأةً ولا شيخاً كبيراً ... ولا تذبحوا بغيراً ولا بقرةً الا لمأكل ... ولا تخربوا عمراناً ولا تقطعوا شجرة الا لنفع ...وأحسنوا ان الله يحب المحسنين

"যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো গীর্জাবাসী, সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[17]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। উপর্যুক্ত শর্তাবলির বিদ্যমানতায় জিহাদ শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ আত্মরক্ষামূলক হতে পারে। আবার তা আক্রমনাত্মক বা নিবৃত্তিমূলকহতে পারে। রাষ্ট্র প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

আযীমআবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক্ক, আওনুল মা'বুদ ৭/১১১; মুনাবী, আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি.), ফাইদুল কাদীর ২/৩০; সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি.), সুবুলুস সালাম ৪/৪১; শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.), নাইলুল আওতার ৮/২৫।

[7] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৪৮১-১৪৮২; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪২৫।

[8] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১।

[9] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।

[10] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৩০।

[11] ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওারিজ, পৃ. ৪৭-৫৭।

[12] সূরা (২২) হজ্জ, আয়াত ৩৯।

[13] সূরা (৮) আনফাল: আয়াত ৭২।

[14] সূরা (৮) আনফাল: আয়াত ৬১।

[15] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৩১১-৩১২।

[16] সূরা (২) বাকরা: আয়াত ১৯০।

[17] বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.), আস-সুনানুল কুবরা ৯/৯০।

মোট কথা ইসলামী শর্তসাপেক্ষে ,

নেতৃত্ব দিতে হবে বৈধ মুসলিম শাসককে।

আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকতে হবে।

নিরীহ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়কে ক্ষতি না করা।

প্রথমে দাওয়াত ও সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে।

উদ্দেশ্য হতে হবে

ইসলাম রক্ষা করা।

মুসলমানদের জীবন, স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ।

নিরপরাধদের ওপর জুলুম বন্ধ করা।

জিহাদ সম্পর্কে আধুনিক ভুল ধারণা:

আবেগের নাম জিহাদ নয় জিহাদ সম্পর্কে বর্তমান যুগে বহু ভুল ধারণা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে মিডিয়া, রাজনীতি এবং কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠীর কারণে।ইসলাম ধর্মে কিছু হলেই মারামারি করতে বলে। অথচ অন্য ধর্মগুলো কত শান্তির। সেই সব ধর্ম মানুষকে সবসময় মিলে-মিশে থাকতে বলে, যত সম্ভব অহিংসার পথ অবলম্বন করতে বলে। কিন্তু ইসলাম একরোখা ধর্ম, এটি মানুষকে অন্যায়ের প্রতি সহনশীল হতে বলে না, নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য যুদ্ধ করতে বলে ইত্যাদি।

নিচে জিহাদ নিয়ে আধুনিক ভুল ধারণা গুলো তুলে ধরা হলো:

১. জিহাদ মানেই "সন্ত্রাস" বা "হত্যাযজ্ঞ":

অথচ জিহাদ অর্থ:সংগ্রাম বা চেষ্টা।

এটি আত্মিক, নৈতিক, শিক্ষা ও দাওয়াতমূলক প্রয়াসেরও নাম।

সন্ত্রাস, নিরপরাধ মানুষ হত্যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম

(সূরা মায়িদা ৫:৩২)

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰي بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।[১] তাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।[২]

[১] এই অন্যায়ভাবে হত্যার পর, মানুষের প্রাণের মূল্য যে কত বেশী ও তার মর্যাদা যে কত বড়, তা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ বানী ইস্রাঈলের উপরে এই নির্দেশ অবতীর্ণ করে বলে দিয়েছেন। যার দ্বারা এই অনুমান করা যায় যে, আল্লাহর নিকট মানুষের রক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা কত! আর এই নীতি শুধু বানী ইস্রাঈলদের জন্য ছিল না; বরং ইসলামী মূলনীতি মোতাবেক এই নীতি চিরস্থায়ী সকলের জন্য। সুলাইমান বিন রাবী' বলেন, আমি হাসান বাসরী (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'বানী ইস্রাঈল যেমন এ হুকুমের আওতাভুক্ত ছিল,

তেমনি আমরাও কি এই আয়াতের হুকুমের আওতাভুক্ত?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বানী ইস্রাঈলের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা কোনক্রমেই অধিক মর্যাদাপূর্ণ নয়।' (তাফসীর ইবনে কাসীর)

[২] আয়াতের এই অংশে ইয়াহুদীদেরকে ভীতি-প্রদর্শন ও তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা তাদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত নবীগণ সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমাণ নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নীতিই হচ্ছে সব সময় সীমালঙ্ঘন ও বিরুদ্ধাচরণ করা। সম্ভবতঃ নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এখানে তাদের কুকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাকে তারা হত্যা করার পরিকল্পনা এবং ক্ষতিসাধন করার যে চক্রান্ত করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং তাদের সমস্ত জীবনটাই ষড়যন্ত্র ও ফিতনাবাজীতে পরিপূর্ণ। সুতরাং তুমি আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা রাখ। তিনিই হচ্ছেন সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। সমস্ত চক্রান্ত হতে তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল অবলম্বনকারী।

২.জিহাদ সব অমুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:

ইসলাম কখনো কেবল অমুসলিম হওয়ার কারণে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। যুদ্ধ শুধুমাত্র আক্রমণের জবাব বা জুলুম প্রতিহত করতে অনুমোদিত **(সূরা বাকারা ২:১৯০)** শান্তিপূর্ণ অমুসলিমদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে বলা হয়েছে

(সূরা মুমতাহিনা ৬০:৮)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি[১] এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি,[২] তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।[৩] নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। [৪]

[১] এখানে এমন কাফেরদের সাথে পার্থিব লেনদেন ও আচার-ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। যারা দ্বীন ইসলামের কারণে মুসলিমদের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখে না এবং এর ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। এটা প্রথম শর্ত।

[২] অর্থাৎ, তোমাদের সাথে এমন আচরণও করে না যে, তোমরা হিজরত করতে বাধ্য হয়ে যাও। এটা দ্বিতীয় শর্ত। পরের আয়াত থেকে তৃতীয় আর একটি শর্তও পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তা হল, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যান্য কাফেরদেরকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও করে না; না পরামর্শ দিয়ে, আর না অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে।

[৩] অর্থাৎ, এই ধরনের কাফেরদের সাথে অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা নিষেধ নয়। যেমন, আসমা বিনতে আবী বাকর (রাঃ) তাঁর মুশরিক মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, صِلِيْ أُمَّكِ □ *"তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর।"**(বুখারীঃ আদব অধ্যায় ২৬২০নং, মুসলিমঃ যাকাত অধ্যায়ঃ ১০০৩নং)***

[৪] এতে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি, কাফেরদের সাথেও। হাদীস শরীফে ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারকারীদের ফযীলত এইভাবে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর নিকট যারা

*ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।"**(মুসলিম ১৮২৭ নং)***

৩. জিহাদ করলে শহীদ হয়ে নিশ্চিত জান্নাত:

কেবলমাত্র আল্লাহর পথে সৎ নিয়ত ও সঠিক উদ্দেশ্যে জিহাদ করলেই শহীদ ও জান্নাতপ্রাপ্ত হওয়া যায়।অন্যায়ভাবে, নিজের স্বার্থে বা চরমপন্থার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলে তা “বাগী” বা দাঙ্গাবাজ হিসেবে গণ্য হয়।

৪.যে কেউ নিজের সিদ্ধান্তে জিহাদ ঘোষণা করতে পারে:

ইসলামে জিহাদ ঘোষণার অধিকার শুধু মুসলিম শাসকের বা বৈধ নেতৃত্বের অধিকার।
ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীভিত্তিক সশস্ত্র জিহাদ চালানো হারাম।

৫. জিহাদ আধুনিক সমাজে অপ্রয়োজনীয় বা বর্বর ধারণা:

আধুনিক সমাজে জিহাদ মানে আত্মসংযম, নৈতিকতা, শিক্ষা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো—এগুলো এখনও প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।এটি ন্যায় ও মানবতার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার নাম।

৬. জিহাদ কেবল যুদ্ধের মাধ্যম:

জিহাদ হতে পারে কলম, ভাষা, দাওয়াত, আত্মসংযম, জ্ঞান, শিক্ষা ও অর্থের মাধ্যমেও।
যুদ্ধ হলো শেষ ধাপ, শুধুমাত্র আত্মরক্ষার প্রেক্ষাপটে।

জিহাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (ইসলামী ও সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ)

জিহাদের পক্ষে যুক্তি (ইসলামী ও ন্যায়ভিত্তিক প্রেক্ষাপট থেকে):

যুক্তি	ব্যাখ্যা
১. আত্মরক্ষার অধিকার	১. মুসলমানদের জীবন, ধর্ম, ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।
২. অত্যাচার রোধ	কুরআন মজলুমকে সাহায্য করার নির্দেশ দেয় (সূরা হজ ২২:৩৯)।
৩. ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা	ইসলাম জুলুম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করে।
৪. শুধু সশস্ত্র নয়, নৈতিক জিহাদ	নফস, শয়তান, অন্যায় ইত্যাদির বিরুদ্ধে আত্মিক সংগ্রামও জিহাদ।
৫. সীমাবদ্ধতা ও নীতিমালা রয়েছে	নিরীহ, নারী, শিশু হত্যা হারাম; নেতৃত্ব ছাড়া যুদ্ধ নিষিদ্ধ।

**পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, জিহাদ একটি ন্যায়ভিত্তিক আত্মসংগ্রাম ও রক্ষামূলক ধর্মীয় দায়িত্ব।*

জিহাদের বিপক্ষে (ভুল প্রয়োগ ও অপব্যাখ্যার কারণে যে আপত্তি বা সমালোচনা উঠে):

যুক্তি	**ব্যাখ্যা**
১. সহিংসতার অপব্যবহার	কিছু গোষ্ঠী রাজনৈতিক বা সামরিক স্বার্থে জিহাদ শব্দ ব্যবহার করে চরমপন্থা চালায়।
২. ধর্মীয় সহিংসতার ভুল ব্যাখ্যা	পশ্চিমা মিডিয়ায় "জিহাদ" মানেই সন্ত্রাস হিসেবে উপস্থাপিত হয়।
৩. অশিক্ষা ও ভুল দাওয়াত	অনেক মুসলিমই জিহাদের প্রকৃত অর্থ জানে না, ফলে বিভ্রান্তি ছড়ায়।
৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অপপ্রয়োগ	কিছু রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী "জিহাদ" ব্যানারে সন্ত্রাস চালিয়ে ইসলামের নাম ক্ষুণ্ন করে।

৫. ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা	ইসলামকে ‘সহিংস ধর্ম’ প্রমাণ করতে জিহাদের অপব্যাখ্যা ছড়ানো হয়।

**বিপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, এর অপব্যবহার ও ভুল ব্যাখ্যা বহু বিভ্রান্তি ও ক্ষতির কারণ।*

জিহাদে সাহাবাদের গুরুত্ব সংক্ষেপে:

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সঙ্গী, যারা ইসলামের সূচনালগ্নে জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা শুধু যুদ্ধ করেননি, বরং আত্মত্যাগ, সাহস, ঈমান ও তাওয়াক্কুলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

দিক	**ব্যাখ্যা**
১. ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	সাহাবিরা জীবনের প্রথম যুগেই অত্যাচার, হিজরত ও যুদ্ধের মাধ্যমে ঈমান প্রমাণ করেন।
২. ইসলামের প্রচার ও রক্ষা	তাঁদের জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে পারস্য, রোম, আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে।

৩. রাসূল (সা.)-এর সাথী হিসেবে যুদ্ধ	তাঁরা সরাসরি রাসূলের নেতৃত্বে জিহাদে অংশ নেন, যেমন **বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন** ইত্যাদি।
৪. ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও জুলুম প্রতিরোধ	তাঁরা যুদ্ধ করেছেন কেবল আত্মরক্ষা ও অন্যায় দমন করতে, দুনিয়ার লোভে নয়।

রাসূল (সা.) জীবদ্দশায় যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে মোট **২৭টি "গযওয়া" (যুদ্ধ)** সংঘটিত হয়, যার মধ্যে **৯টি বা ১০টিতে** সরাসরি মুখোমুখি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

- **গাযওয়া (غزوة)** অর্থ এমন যুদ্ধ, যাতে রাসূল (সা.) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।
- **সারিয়্যা (سرية)** অর্থ এমন সামরিক অভিযান যা সাহাবাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, কিন্তু রাসূল (সা.) সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি।

বড় (প্রধান) যুদ্ধ ৯-১০টি নিচে সংক্ষেপে দেয়া হলো:

বদর যুদ্ধ (২য় হিজরী)

মুসলিম ইতিহাসের প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ বদর। দ্বিতীয় হিজরী মদিনার উপকণ্ঠে বদর নামক স্থানে মুখোমুখি হয় মুসলিম ও কুরাইশ বাহিনী। ঐতিহাসিক এ যুদ্ধ ছিল অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই। ইসলাম ও মুসলিমদের অস্তিত্বের সংগ্রাম। বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা অসম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন। অস্তিত্বের সংকট থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্তি দিয়ে অমিত সম্ভাবনার দুয়ারে পৌঁছে দেন।

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট:
বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক সামরিক সংঘর্ষ, যা হিজরী ২য় সালের ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পেছনে বেশ কিছু ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- **মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা ও অত্যাচার:** রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন, তখন মক্কার কুরাইশরা তা প্রতিহত করার জন্য নির্যাতন শুরু করে।মুসলমানদের উপর নির্যাতন এতটাই বেড়ে যায় যে তারা মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন।

- **মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র গঠন:** হিজরতের পর মদিনায় মুসলমানরা একটি সংঘবদ্ধ সমাজ গঠন করেন এবং রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম

হয়।মক্কার কুরাইশরা এই নতুন রাষ্ট্রকে হুমকি মনে করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

- **মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা:** মক্কার কাফিররা হিজরতকারী মুসলমানদের সম্পদ জব্দ করে এবং তাদের আর্থিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করে।মুসলমানদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাসূল (সা.) কুরাইশদের একটি ব্যবসায়িক কাফেলার গতিবিধি নজরদারি শুরু করেন।

- **আবু সুফিয়ানের কাফেলা ও মুসলমানদের অভিযান:** আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এক বিশাল বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফেরার পথে ছিল।মুসলমানরা এই কাফেলাটি বাধা দেওয়ার জন্য বের হন, যাতে তারা জব্দকৃত সম্পদের কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

- **কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতি:** আবু সুফিয়ান কাফেলা রক্ষায় সাহায্য চেয়ে মক্কায় বার্তা পাঠান।কুরাইশরা ১০০০ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রওনা হয়।

সূরা আল-আনফাল (৮:১–১৯)
সহীহ বুখারী: ৩৯৫২
মুসলিম: ১৭৬৩

*এই পটভূমির প্রেক্ষিতে বদরের ময়দানে মুসলমানদের মাত্র **৩১৩** জন সৈন্য এবং কুরাইশদের **১০০০** জন সৈন্যের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইসলামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ে রূপ নেয়।**হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামযা (রাঃ) ও হযরত উবায়দা (রাঃ)** সম্মুখযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

উহুদের যুদ্ধ (৩য় হিজরী)

উহুদ যুদ্ধ হিজরী ৩য় সনে (৬২৫ খ্রিস্টাব্দ) মদিনার অদূরে উহুদ পর্বতের পাদদেশে সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের দ্বিতীয় বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট ছিল:

উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট:

- **বদরের প্রতিশোধ:** বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে কুরাইশরা চরম অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়। তারা বদরের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

- **মক্কার রাজনৈতিক মর্যাদা রক্ষা:** কুরাইশ নেতারা মক্কার নেতৃত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে মুসলমানদের শক্তি দমন করতে চায়।

- **ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি:** আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে কুরাইশরা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।

- **মদিনার প্রতিরক্ষা:** মুসলমানরা প্রথমে শহরের ভেতরে আত্মরক্ষা করার চিন্তা করলেও পরে পরামর্শক্রমে উহুদের কাছে গিয়ে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন।

- **ইহুদি ও মুনাফিকদের ভূমিকা:** যুদ্ধের আগে এবং পরে মদিনার কিছু মুনাফিক ও ইহুদি গোত্র গোপনে মুসলমানদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে।

*কঠিন পরীক্ষার যুদ্ধ, যেখানে ৭০ সাহাবি শহীদ হন।হযরত হামজা (রাঃ) এখানে শাহাদাত বরণ করেন।উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে বিজয়ী হলেও, পাহাড়ের ঢালে নিয়োজিত তীরন্দাজ দল আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ছিল বড় শিক্ষা ও আত্মসমালোচনার সুযোগ। জিহাদে ধৈর্য, আনুগত্য ও নিয়তের বিশুদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা আলে ইমরান (৩:১২১-১২৯)
[সহীহ বুখারী: ৪০৪৩,
মুসলিম: ১৭৯০]

খন্দকের যুদ্ধ (৫ম হিজরী)

খন্দক যুদ্ধ অর্থ **পরিখা যুদ্ধ**, যাকে **আহজাবের যুদ্ধ** নামেও ডাকা হয়, **হিজরি ৫ম সনে (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ)** সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রতিরক্ষা কৌশলের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। নিচে সংক্ষেপে এর প্রেক্ষাপট দেওয়া হলো:

খন্দক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট:

- **কুরাইশ ও মিত্রদের ষড়যন্ত্র:** বদর ও উহুদ যুদ্ধের পরও কুরাইশরা মুসলমানদের ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদি গোষ্ঠীকে নিয়ে এক বিরাট মিত্রজোট (আহজাব) গঠন করে।

- **ইহুদি গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা:** মদিনার ইহুদি গোত্র বনু নাজিরকে মদিনা থেকে বহিষ্কারের পর তারা মক্কা ও অন্যান্য গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে উৎসাহিত করে।

- **বিশাল বাহিনীর আগমন:** প্রায় ১০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে এই জোট মদিনার দিকে অগ্রসর হয়, যা মুসলমানদের জন্য এক বিপুল হুমকি ছিল।

- **পরিখা খননের পরিকল্পনা:** সাহাবী সালমান ফারসির (রাঃ) পরামর্শে মহানবী (সা.) মদিনার খোলা দিক ঘিরে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেন। এ ছিল আরবের জন্য এক নতুন কৌশল।
- **আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ:** মুসলমানরা শহরের ভেতরে অবস্থান নিয়ে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে শত্রুদের মোকাবিলা করে, যা দীর্ঘ অবরোধে পরিণত হয়।

সূরা আল-আহযাব (৩৩:৯-২৭) এই সূরায় খন্দক যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরীক্ষার, ধৈর্য ও বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।এই যুদ্ধ মূলত ধৈর্য, কৌশল ও একতা দিয়ে মুসলমানদের বিজয়ে পরিণত হয়, যদিও সরাসরি মুখোমুখি যুদ্ধ খুব কমই হয়েছিল। আল্লাহর সাহায্যে বাতিলের বড় এক জোট পরাজিত হয়।মদীনায় প্রতিরক্ষা যুদ্ধ, যেখানে ১০,০০০ কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানরা খন্দক কেটে রক্ষা পান। **সাহাবি সালমান ফারসী (রাঃ) – খন্দক কাটা পরিকল্পনার জনক।**
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৪১০১:
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৮০৩:]

গযওয়া বনু কুরাইযা (৫ম হিজরী)

বনু কুরাইযা অভিযান **(৫ম হিজরী)** ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান, যা ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এটি সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধ (আহযাবের যুদ্ধ) শেষে। নিচে এর প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

প্রেক্ষাপট:

- **খন্দকের যুদ্ধের পটভূমি (৫ম হিজরী):**মক্কার কুরাইশদের নেতৃত্বে একটি বড় সম্মিলিত বাহিনী (মুশরিক ও ইহুদিদের নিয়ে) মদিনার মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে।রাসূল (সা.) সাহাবিদের পরামর্শে মদিনার চারপাশে খন্দক (পরিখা) খনন করেন, যা শত্রুদের অগ্রগতি থামিয়ে দেয়।এই যুদ্ধ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় এবং শেষে আল্লাহর সাহায্যে শত্রু বাহিনী পরাজিত হয়।

- **বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা:** খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন, মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা মুসলমানদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে।তারা গোপনে কুরাইশদের সাথে মিলে মুসলমানদের পশ্চাদ্দেশ থেকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, যাতে মুসলমানরা দুই দিক থেকে চেপে পড়ে।তারা মুসলমানদের সাথে করা প্রতিরক্ষা চুক্তি (মদিনার সংবিধান অনুযায়ী) লঙ্ঘন করে।

- **মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া:** খন্দকের যুদ্ধ শেষে আল্লাহর নির্দেশে (সূরা আহযাব: ২৬-২৭ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে), রাসূল (সা.) বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।তারা ২৫ দিন অবরোধে থাকার পর আত্মসমর্পণ করে।

- **সাআদ ইবন মু'আয (রা.)-এর রায়:** রাসূল (সা.) তাদের বিচার করার দায়িত্ব দেন সাআদ ইবন মু'আয (রা.)-কে, যিনি ছিলেন বনু আওস গোত্রের নেতা এবং বনু কুরাইযার পুরাতন মিত্র।তিনি তাওরাতের বিধান অনুসারে রায় দেন—পুরুষদের হত্যা, নারীদের ও শিশুদের বন্দি করা, ও সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন।প্রায় ৬০০-৯০০ জন পুরুষকে (ইতিহাসবিদদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় সংখ্যা ভিন্ন) হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী-শিশুদের বন্দি করা হয়।

সূরা আল-আহযাব ৩৩:২৬-২৭

"আর তিনি (আল্লাহ) কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদের (মুসলমানদের) সাহায্য করেছিল, তাদের ঘরবাড়ি থেকে নামিয়ে আনলেন এবং তাদের অন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেন; তোমরা তাদের একদলকে হত্যা করেছো এবং একদলকে বন্দী করেছো..."

সাআদ ইবন মু'আয (রা.)-এর রায়:

তিনি বলেন:

> *"পুরুষদের হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদের বন্দি করা হোক, এবং তাদের সম্পদ বণ্টন করা হোক।"*

রাসূল (সা.) বললেন:

> *"তুমি তো আল্লাহর রায়ই দিয়েছো।"*

(বুখারি, হাদীস ৩০৪৩; মুসলিম, হাদীস ১৭৬৯) [সিরাত ইবনে হিশাম, ৩/২২৭,আল-ওয়াকিদি (কিতাবুল মাগাযি), ইবনে কাসীর (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)]

*****বনু কুরাইযা অভিযানের মূল প্রেক্ষাপট ছিল তাদের চুক্তিভঙ্গ ও যুদ্ধাবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা। এই অভিযান ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করে এবং প্রতারণার পরিণতি কী হতে পারে, তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামের অস্তিত্বের জন্য হুমকি ছিল, তাই যুদ্ধশেষে রাসূল (সা.) তাদের অবরোধ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

গাযওয়া বনু মুস্তালিক (৬ষ্ঠ হিজরী)

গাযওয়া বনু মুস্তালিক (غزوة بني المصطلق) বা **গাযওয়া মুরাইসী ৬ হিজরীতে** সংঘটিত হয়। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচালনা করেন। এই অভিযানের পেছনে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক প্রেক্ষাপট ছিল।

প্রেক্ষাপট:

- **বনু মুস্তালিক গোত্রের হুমকি:** বনু মুস্তালিক ছিল হুযাইল গোত্রের একটি শাখা। তারা মক্কার কুরাইশদের সাথে মিত্র ছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

ছিল। গোত্রনেতা হারিস ইবন আবি দিরার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং অন্যান্য গোত্রদেরও উসকে দিচ্ছিল।

- **গোয়েন্দা তথ্য:** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান যে বনু মুস্তালিক মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন তিনি গোয়েন্দা পাঠান সত্যতা যাচাই করতে। গোয়েন্দারা ফিরে এসে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে।

- **প্রতিকারমূলক যুদ্ধ:** রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের উপর সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রথমে অভিযান শুরু করেন। এই যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক হলেও একটি সুনির্দিষ্ট কৌশলের অংশ ছিল।

-

***সহীহ বুখারী:**

>عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْمُرَيْسِيعِ.. ِ

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪১৪১)

এই হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, তাঁরা রাসূলের সাথে গাযওয়া মুরাইসী বা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

ইবন ইসহাক ও ইবন হিশাম (সীরাত গ্রন্থ):

ইবন হিশাম তাঁর “আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> **“রাসূলুল্লাহ (সা.) খবর পেলেন যে হারিস ইবন আবি দিরার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোক জমায়েত করছে...”**

*** ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে "ইফক" এর ঘটনা:**

এই যুদ্ধে ফেরার পথে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ওপর অপবাদ (হাদীস ইফক) ছড়ানো হয়েছিল, যা কুরআনে (সূরা নূর) খণ্ডন করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে এই অভিযান বাস্তবেই সংঘটিত হয়েছিল।

গযওয়া খাইবার (৭ম হিজরী)

গাযওয়া খাইবার **(৭ম হিজরী)** — এর প্রেক্ষাপট ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের ইহুদিদের হুমকি প্রতিরোধ। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হলো:

প্রেক্ষাপট

- **খাইবারের ভৌগোলিক ও কৌশলগত গুরুত্ব:** খাইবার ছিল মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত একটি দুর্গসমূহে ঘেরা অঞ্চল।এটি ছিল সমৃদ্ধ কৃষিভিত্তিক জনপদ এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী।সেখানে বেশ কিছু প্রভাবশালী ইহুদি গোত্র (যেমন—বানু নাযীর, বানু কুরাইযা বহিষ্কারের পর এখানে স্থান নেয়) বসবাস করত, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

- **ইহুদি গোত্রদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র:** বানু নাযীর ও অন্যান্য ইহুদি গোত্র খাইবারে আশ্রয় নিয়েছিল, যারা পূর্বে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়।তারা মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে মিলে খন্দকের যুদ্ধ (৫ হিজরি)-এ মদীনার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ চালাতে সাহায্য করেছিল।যুদ্ধ শেষে, তারা আবার নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ও পারস্য ও গাসসানিদের সাথে যোগাযোগ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোট গঠনের চেষ্টা চালায়।

- **হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রভাব (৬ষ্ঠ হিজরী):** মুসলিমদের সাথে কুরাইশদের হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর, দক্ষিণ ফ্রন্ট শান্ত হয়ে যায়।এখন মুসলিমরা উত্তর ফ্রন্টে মনোযোগ দিতে পারেন, বিশেষত খাইবারে থাকা শত্রুদের মোকাবিলা করা জরুরি হয়ে পড়ে।কারণ, খাইবার ছিল একধরনের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র।

- **মুসলিমদের কৌশলগত লক্ষ্য:** মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল-

খাইবারের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ভেঙে দেওয়া।
ইহুদি ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটানো।
মুসলিম রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করা।
ইসলামি দাওয়াহ ও নিরাপত্তার পথ খুলে দেওয়া।

> সাহিহ আল-বুখারী (হাদীস ৪২১০): রেওয়ায়েত: সাহাবি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) খাইবারে গনি'মতের মাল অর্জন করলেন..."

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, باب غزوة خيبر)

> সাহিহ মুসলিম (হাদীস ১৩৬৫): রেওয়ায়েত: আলী (রা.)-কে খাইবারের দিন বিজয়ের জন্য পতাকা প্রদান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"আমি এমন একজনকে এই পতাকা দিব যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাঁকে ভালোবাসেন..."
— এরপর আলী (রা.)-কে ডেকে এনে পতাকা দেওয়া হয়।

(ক) সীরাত ইবন হিশাম (جلد ২): এখানে পুরো খাইবার অভিযান, দুর্গসমূহের নাম, সাহাবিদের ভূমিকা, ও যুদ্ধপরবর্তী মুআহাদার বিবরণ পাওয়া যায়।
(খ) তারীখ আত-তাবারী (Tarikh al-Tabari): খাইবার যুদ্ধকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রেক্ষাপট ও ফলাফলসহ।

গযওয়া মক্কা বিজয় (৮ম হিজরী)
মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ বিজয়, যেখানে প্রায় রক্তপাতহীনভাবে কাবাঘর ও মক্কা দারুল ইসলাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রেক্ষাপট

- ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে, যার শর্ত ছিল ১০ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি।

- **চুক্তির একটি শর্ত ছিল:** উভয়পক্ষ কোনো গোত্রের সঙ্গে জোট করতে পারবে। ফলে:
  মুসলমানরা: খুজা'আ গোত্রের মিত্র হয়
  কুরাইশরা: বনু বকর গোত্রের মিত্র হয়

- এরপর কুরাইশ মক্কার মুশরিকরা বনু বকরকে সহায়তা করে খুজা'আ গোত্রের ওপর হামলা করে, এতে বহু খুজা'আ সদস্য নিহত হয়।এটি ছিল হুদায়বিয়া চুক্তিভঙ্গ।

- খুজা'আ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে সাহায্য প্রার্থনা করে।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) গোপনে ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হন, যাতে রক্তপাত এড়ানো যায়।

- মুসলিম বাহিনী মক্কা শহর ঘিরে ফেলে। মক্কার নেতারা আতঙ্কিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।

- রাসূল (সা.) পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন:
- "আজ তোমাদের প্রতি কোনো গঞ্জনা নেই, তোমরা সবাই মুক্ত!"

(ইবনে হিশাম, সীরাহ)
সূরা আন-নাসর-(১১০:০১)

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ۙ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে..."
— এই আয়াত মক্কা বিজয় উপলক্ষে নাযিল হয়।

[সহীহ বুখারী: হাদীস ৪২৮০, ৪২৮৬]
[সহীহ মুসলিম: হাদীস ১৭৮০ (মক্কা বিজয়ের ঘটনা ও ক্ষমা ঘোষণা)]

গাযওয়া হুনাইন (৮ম হিজরী)

গাযওয়া হুনাইন ছিল মক্কা বিজয়ের ঠিক পর সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, যা ইসলামের ইতিহাসে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমে বিশৃঙ্খলার মুখে পড়লেও, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যে বিজয় অর্জন করেন।

প্রেক্ষাপট

- মক্কা বিজয়ের পর, ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এতে আশপাশের কিছু শক্তিশালী গোত্র, বিশেষত:

হাওয়াযিন

সাকীফ

আতঙ্কিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

- এই দুই গোত্র হুনাইন নামক উপত্যকায় সম্মিলিতভাবে অবস্থান নেয় এবং কৌশলগতভাবে এক সংকীর্ণ জায়গায় ঘাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়, যাতে মুসলিম বাহিনী ঢুকলেই তারা অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে।

- মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,০০০, যা ইসলামের ইতিহাসে সেই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বাহিনী। কিছু মুসলমান এ সংখ্যায় গর্ববোধ করে।

- হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াযিন বাহিনী তাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালায়, এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অনেকে পিছু হটে যায়।

- 5. তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তার ডাকে সাহাবারা আবার সংগঠিত হয়ে ফিরে আসে।

- 6. আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে, হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র পরাজিত হয়।

*****এই যুদ্ধ মুসলমানদের শেখায় যে সংখ্যা নয়, বরং ঈমান, নেতৃত্ব ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলই মূল বিজয়ের উপায়।

সূরা আত-তাওবা(৯:২৫-২৬):

حلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍۢ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًۭٔا...

“হুনাইনের দিনেও আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা সংখ্যাধিক্যে গর্ব করেছিলে, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি...”

তাফসীর ইবন কাসীর, তাফসীর কুরতুবী প্রভৃতি তাফসীরে একমত যে এখানে স্পষ্টভাবে হুনাইন যুদ্ধ-এর কথা বলা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম — হাদীস: ১৭৭৫

সহীহ বুখারী — হাদীস: ৪৩২৩

> রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের পরে হাওয়াযিনদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, এবং হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সীরাত ইবনে হিশাম (খণ্ড ২):

হুনাইন যুদ্ধের পটভূমি, যুদ্ধের কৌশল, মুসলিম বাহিনীর পিছু হটা ও পুনরুদ্ধার, রাসূল (সা.)-এর সাহসিকতা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া – ইবন কাসীর (খণ্ড ৪):পুরো যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গযওয়া তাইফ (৮ম হিজরী)

গাযওয়া তাইফ ছিল গাযওয়া হুনাইন যুদ্ধের সরাসরি পরবর্তী অভিযান। ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি কৌশলগত এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ছিল, যা ইসলামের দাওয়াহ ও শত্রুদের মনোভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রেক্ষাপট:

- হুনাইন যুদ্ধে পরাজয়ের পর, হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের কিছু অংশ তাইফ শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, যেটি ছিল সাকীফদের শক্ত ঘাঁটি ও এক প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গনগরী।
- তাইফ ছিল:সুদৃঢ় প্রাচীর ও প্রাকৃতিক দুর্গে ঘেরা শক্তিশালী অস্ত্রভাণ্ডার ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার শহর অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী
- রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় ২০ দিন ধরে সেখানে অবরোধ চালান, তবে শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি।

- মুসলিম বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে:মহার্ঘ্য অস্ত্র, যেমন মঞ্জনীক (গোলক নিক্ষেপ যন্ত্র) ব্যবহার করে তারকাটা/লোহার কাঁটা দ্বারা কিছু সাহাবী আহত হন

- অবশেষে রাসূল (সা.) দ্বিতীয়বার হিজরতের আহ্বান না জানিয়ে তাইফ অবরোধ তুলে নেন, কারণ তিনি চাচ্ছিলেন অযথা প্রাণহানি নয়, বরং তাদের অন্তর জয় করতে।

- পরে তাইফের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, যা ছিল এই মিশনের সবচেয়ে বড় সফলতা।

কৌশলগত গুরুত্ব:
এটি ছিল একটি ধৈর্য ও কৌশলের যুদ্ধ, যেখানে রাসূল (সা.) দেখিয়েছেন যে সরাসরি বিজয় না হলেও, সময় ও দাওয়াহর মাধ্যমে অন্তর জয় করা সম্ভব।

[সহীহ মুসলিম – হাদীস: ১৭৭৫]
> আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন:
“আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে অংশ নিই। যুদ্ধের পর তিনি (সা.) তাইফ অভিযান পরিচালনা করেন...”
— এতে তাইফ অভিযানের ধারাবাহিকতা বোঝা যায়।

[সহীহ বুখারী – হাদীস: ৪৩২৫]
> ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
"তাইফ অভিযানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে অংশ নিই, সেখানে তিনি মঞ্জনীক (গোলক নিক্ষেপ যন্ত্র) ব্যবহার করেন...”
— এখানে যুদ্ধের প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়।

সীরাত ইবনে হিশাম – খণ্ড ২:
এতে তাইফের ঘেরাও, সাকীফ গোত্রের প্রতিরোধ, মুসলিম বাহিনীর ধৈর্য ও কৌশল, এবং পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ-এর বিস্তারিত বিবরণ আছে।

তাবুকের অভিযান (৯ম হিজরী)

তাবুক যুদ্ধ হিজরী **৯ম সনে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)** সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের শেষ বৃহৎ সামরিক অভিযান, যা মূলত প্রতিরক্ষামূলক ছিল এবং রোমান সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। নিচে এর প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

প্রেক্ষাপট:

- **রোমান সাম্রাজ্যের হুমকি:** রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ মদিনায় পৌঁছে। বলা হয়, তিনি বাইজেন্টাইন বাহিনী ও আরব খ্রিষ্টান গোত্রগুলো নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চান।

- **তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি:** ইসলামের বিস্তার দেখে রোমান সাম্রাজ্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের সামর্থ্য ও বিজয় দেখে তারা তাদের প্রভাব ধরে রাখতে চায়, বিশেষ করে উত্তর আরবের আরব খ্রিস্টান অঞ্চলে।

- **কঠিন সময়ের প্রস্তুতি:**এই যুদ্ধের সময় ছিল প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল, খরার সময়, ফল পাকতে শুরু করেছে, এবং পথ ছিল দীর্ঘ (তাবুক ছিল মদিনা থেকে প্রায় ৭০০ কিমি দূরে)। এজন্য এটিকে বলা হয় "غزوة العسرة" (কষ্টের যুদ্ধ)। সাহাবিদের ত্যাগ ছিল অসাধারণ: হযরত উসমান (রাঃ) একাই ৯৫০ উট ও ১০,০০০ দিনার দান করেন।

- **মুনাফিকদের গড়িমসি ও অজুহাত:**অনেক মুনাফিক বাহিনীতে অংশ না নিতে নানা অজুহাত দেখায়। তাবুক যুদ্ধ কেবল বাহ্যিক হুমকির বিপরীতে নয়, বরং মুসলিম সমাজের ভেতরের দুর্বলতা ও দ্বিমুখিতার বিরুদ্ধেও ছিল এক ধরনের পরীক্ষামূলক অভিযান।

- **রাসূল (সা.) এর দূরদর্শিতা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) রোমানদের মোকাবেলায় সাহসিকতা ও কৌশলে তাবুক অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। তবে যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুপক্ষ পিছু হটে যায়। তাবুক ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিজয়।

> "হে মুমিনগণ! তোমরা কী কারণে বোঝা হয়ে বসে আছো, যখন তোমাদের বলা হয়েছে, ‘আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে চলো?" ***(সূরা তাওবা: আয়াত ৩৮)***

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুল করেছেন নবী, মুহাজির ও আনসারদের, যারা কঠিন সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিল" ***(সূরা তাওবা: আয়াত ১১৭)***

[সহীহ বুখারী – হাদীস ৪৪১৮,সহীহ মুসলিম – হাদীস ২৭৬৯]

গাযওয়াতুল হিন্দ

গাযওয়াতুল হিন্দ (غزوة الهند**)** বলতে সাধারণত ইসলামি ঐতিহ্য ও হাদীস সাহিত্যে বর্ণিত এক গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুদ্ধকে বোঝানো হয়, যা হিন্দ (ভারত) ভূখণ্ডে সংঘটিত হবে। এটি কেয়ামতের পূর্বে সংঘটিত একটি মহাযুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে মুসলমানরা ভারতের মুল্লুকে জিহাদে অংশ নেবে এবং সেখানে বিজয় লাভ করবে—এমনটি বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

গাযওয়া (غزوة**):** অর্থাৎ **যুদ্ধ বা অভিযান**, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় বা তাঁর সুন্নাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ বোঝায়।

হিন্দ (الهند**): ভারতের ভূখণ্ড বা উপমহাদেশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।**

সুনান আন-নাসাঈ (হাদীস: ৩১৭৫):

ثنتان من أمتي، أحرزهما الله من النار: غزوة الهند، وغزوة مع عيسى بن مريم.

অর্থ: আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন: একদল যারা হিন্দে যুদ্ধ করবে এবং অন্যদল যারা ঈসা (আ.)-এর সাথে যুদ্ধ করবে।

মুসনাদ আহমাদ (হাদীস: ২৭২৪৯):

> হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, "আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদের গাযওয়াতুল হিন্দের কথা বলেছেন, আমি যদি তা পাই, তাহলে শহীদ হবো, আর যদি ফিরে আসি, তবে আমি মুক্ত হই যাবো আগুন থেকে।"

গাযওয়াতুল হিন্দের বৈশিষ্ট্য:

- এটি একটি মহান ও পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে বর্ণিত।
- এতে অংশগ্রহণকারীরা শহীদ অথবা নাজাতপ্রাপ্ত (জাহান্নাম থেকে মুক্ত) হবে।
- যুদ্ধটি ভারতীয় উপমহাদেশে সংঘটিত হবে।
- এই যুদ্ধ মুসলমানদের বিজয়ের আধ্যাত্মিক ও ঐশী প্রতিশ্রুতি বহন করে।

গাযওয়াতুল হিন্দ কেন্দ্রিক ৬টি ঐতিহাসিক অভিযান:

গাযওয়াতুল হিন্দ-কে কেন্দ্র করে মুসলিম ইতিহাসে কমপক্ষে ৬টি বড় সামরিক অভিযান ঘটেছে, যেগুলো ইসলাম প্রচার, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে পরিচালিত হয়। এই অভিযানগুলোকে অনেকে গাযওয়াতুল হিন্দ হাদীসের সম্ভাব্য বাস্তবায়ন বা তার প্রভাবস্বরূপ হিসেবে মনে করেন।

ক্রম	অভিযান	বছর (খ্রিস্টাব্দ)	নেতৃত্ব	প্রধান লক্ষ্য / ফলাফল
১	মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান	৭১১	মুহাম্মদ বিন কাসিম	সিন্ধু জয়, ইসলামের প্রথম প্রবেশ
২	মাহমুদ ঘজনবীর ভারত আক্রমণ	১০০০–১০৩০	মাহমুদ ঘজনবী	সোমনাথসহ ১৭ বার আক্রমণ

৩	মুহাম্মদ ঘোরি ও দ্বিতীয় তারায়ণের যুদ্ধ	১১৯২	মুহাম্মদ ঘোরি	পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লি সালতানত প্রতিষ্ঠা
৪	বাবরের পানিপথের যুদ্ধ	১৫২৬	জহিরুদ্দিন বাবর	মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা
৫	আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ ভারত অভিযান	১৬৫৮–১৭০৭	আওরঙ্গজেব আলমগীর	ইসলামি শাসন সুদৃঢ়করণ
৬	ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত ও ধর্মভিত্তিক আন্দোলন	১৯১৯–১৯৪৭	বিভিন্ন আলেম ও সংগঠন	ইসলামী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

১ম অভিযান: মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলাম প্রচারের পথ খুলে দেন।

২য় অভিযান: মাহমুদ ঘজনবীর ধারাবাহিক আক্রমণ ছিল মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ।

৩য় ও ৪র্থ: ঘোরি ও বাবরের যুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

৫ম: আওরঙ্গজেব ইসলামি আইন প্রয়োগে সক্রিয় হন।

৬ষ্ঠ: আধুনিক যুগে মুসলিমদের মধ্যে গাযওয়াতুল হিন্দ চেতনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক-ধর্মীয় আন্দোলন দেখা যায়।

*মোট ৬টি প্রধান ঐতিহাসিক অভিযানকে গাযওয়াতুল হিন্দের প্রভাবে সংগঠিত অভিযান হিসেবে ইতিহাসবিদরা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, গাযওয়াতুল হিন্দের আসল ও ভবিষ্যদ্বাণীকৃত যুদ্ধ এখনো সংঘটিত হয়নি—তা কেয়ামতের পূর্বে ঘটবে।

উপসংহার:

জিহাদ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যার প্রকৃত অর্থ হলো—আল্লাহর পথে আন্তরিক চেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ। এটি কেবলমাত্র যুদ্ধের নাম নয়; বরং নিজের নফস, শয়তান, অন্যায়, অন্যায়কারী ও সমাজের অশান্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক এবং নৈতিক সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক সমাজে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার ব্যাপক হলেও, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জিহাদ হল শান্তি, ন্যায়, মানবতা ও আত্মসংযম প্রতিষ্ঠার একটি উপায়। রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন থেকে প্রমাণিত হয় যে জিহাদ হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ, নীতিভিত্তিক, সুশৃঙ্খল এবং মহান আত্মত্যাগের আদর্শ।

জিহাদ যেন কখনো অন্যায়, চরমপন্থা বা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়, সে জন্য সঠিক জ্ঞান, নেতৃত্ব ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং, জিহাদ একটি সুন্দর, পূণ্য ও কল্যাণময় আদর্শ—যা হৃদয়, কলম, জ্ঞান, ও প্রয়োজন হলে অস্ত্র দিয়েও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে সবসময় ন্যায়ের পক্ষে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।